ভোরের কাগজ

MAR 09 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

আন্তর্জাতিক সংস্থা ইনস্টিটিউট অফ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট-এর রিপোর্ট

ছাত্রশিবির, হরকাতুল জেহাদ ও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী সংগঠন

বিপ্লব রহমান : দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদের ওপর গবেষণাকারী সংস্থা 'ইনস্টিটিউট অফ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট' (আইসিএম) বাংলাদেশের ৩টি সংগঠনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ সংগঠনগুলো হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), মৌলবাদী হরকাত-উল-জেহাদ-আল-ইসলামী (হুজি) এবং ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির।

আইসিএমের ২০০১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে ঐ ৩টি রাজনৈতিক সংগঠনকে পুরোপুরি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়। ভারতের নয়াদিল্লির সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ, এসব সংগঠনের সাম্প্রতিক নৈরাজ্যমূলক তৎপরতা এবং সংগঠনগুলোর বিষয়ে আইসিএমের নিজস্ব অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ ও অভিমত তুলে ধরা হয়। বিস্তারিত এ প্রতিবেদনটি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলোকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি ছাড়া হয়েছে ওয়েবসাইটেও।

দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বছরতিনেক আগে আইসিএম নামক এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাস উপদ্রুত ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা—দক্ষিণ এশিয়ায় এ ৬টি দেশেই আইসিএমের শাখা না থাকলেও প্রতিনিধি রয়েছে। এই প্রথম সন্ত্রাসবাদের ওপর কোনো বিদেশী গবেষণামূলক সংস্থা বাংলাদেশের ঐ ৩টি রাজনৈতিক সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদভিত্তিক বলে চিহ্নিত করলো।

আইসিএমের বিস্তারিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা ভারতের ত্রিপুরা ও বার্মার সীমান্তসংলগ্ন ১৪ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনপদ পাকিস্তান আমল থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ আমলে পাহাড়িদের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, তথা এর গেরিলা গ্রুপ শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনী এবং বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালে ৬০ হাজারেরও বেশি পাহাড়ি শরণার্থী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মানবেতর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকে প্রায় ৫০ হাজার সেটেলার ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ফলে প্রায় দু'দশকে ২৫ হাজারেরও বেশি পাহাড়ি ও বাঙালিকে জীবন দিতে হয়।

দীর্ঘ শান্তি-সংলাপের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলে শান্তি বহিনীর বিলুপ্তি ঘটে। অবসান হয় পাহাড়ের সশস্ত্র সংঘাতের। পাহাড়ি শরণার্থীরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। শান্তিচুক্তি

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কল্পরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী করে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনসংহতি সমিতি ও সাবেক শান্তি বাহিনী প্রধান সন্তুলারমাকে চেয়ারম্যান করে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবিতে শান্তি বাহিনীর একাংশকে নিয়ে ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে গঠিত হয় পাহাড়িদের আরেক বিদ্রোহী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর, পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি ও বাঙালিরা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ইস্যুতে প্রথম থেকেই শান্তিচুক্তির বিপক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়।

এদিকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন পার্বত্য জনপদে রাজনৈতিক সংঘাত, হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজসহ সব ধরনের সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ৯ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ইউপিডিএফ পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির দুর্গম অরণ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক জন ব্রিটিশ ও দু জন ডেনিশ প্রকৌশলীকে। ১৭ মার্চ এই ৩ জন বিদেশী পণবন্দী মুক্তি লাভের পর জানা যায়, সাবেক শান্তি বাহিনীর একজন নেতার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সশস্ত্র একটি গ্রুপ তাদের অপহরণ করেছিল। এ অপহরণের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দাবি না থাকলেও তাদের লক্ষ্য ছিল মুক্তিপণের টাকা পাহাড়িদের জনকল্যাণে ব্যয় করা।

এতে আরো বলা হয়, সে সময়ই একাধিক পত্রপত্রিকায় তিন বিদেশী জিম্মি নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী কমান্ডো অভিযান চালিয়ে বিদেশীদের মুক্ত করেছে বলে প্রচার করলেও পত্রিকাগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করে যে তাহলে সরকার কেন জিম্মিকারীদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের নিরাপদ অপসারণের সুযোগ করে দেয়, অপরাধমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। এসব এখনো মীমাংসা হয়নি। উল্লেখ্য, সালেও পাহাড়ি বিদ্রোহীরা একজন বি অপহরণ করলে মুক্তিপণ দেওয়ার সেনাবাহিনী তাকে উদ্ধার করেছিল। ১৯৮৪ সালে শান্তি বাহিনী অপহর ১০ কেজি ওজনের সোনার সমপরি মুক্তিপণ আদায় করার পর তাদে দেওয়া হয়।

মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন হরকা জেহাদ-আল-ইসলামীর (হুজি) পরিচ বাংলাদেশে এদের তৎপরতা আইসিএমের প্রতিবেদনে বলা আন্তর্জাতিক ইসলামি জঙ্গি সংগঠন হরকাত ১৯৯২ সালে ওসামা বিন প্রতিষ্ঠা করেন। শওকত ওসমান, শেখ ফরিদ এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইমতি কুদ্দুস এর মহাসচিব। বাংলা আনুমানিক প্রায় ১৫ হাজার হরকাত সম ও সদস্য রয়েছে।

প্রগতিশীল ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা ক সশস্ত্র ইসলামি জেহাদের মাধ্যমে

গড়ে তোলে।

এ ছাড়া ইসলামি ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী আহমেদীয়া মুসলিম জামাত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় বিভিন্ন সময় ছাত্র শিবিরের সরাসরি আক্রমণের শিকার হন। ১৯৯৪ সালে ঢাকার বকশিবাজারের প্রধান কাদিয়ানী মসজিদসহ দেশের একাধিক কাদিয়ানী মসজিদে চালানো হয় সশস্ত্র হামলা। ১৯৯৯ সালে খুলনার কাদিয়ানী মসজিদে বোমা পেতে হত্যা করা হয় একাধিক ধর্মপ্রাণকে। একই সময় বকশিবাজারের মসজিদ থেকেও উদ্ধার করা হয় শক্তিশালী টাইমবোমা।

বাংলাদেশ আমলে গত ৩ দশক ধরে সংগঠিতভাবে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা চালালেও বিস্ময়করভাবে এ পর্যন্ত কোনো সরকারই ছাত্র শিবির সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি বলে আইসিএমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।